ঃ ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

যৌন চেতনার প্রভাবমূলক গল্প

যৌন চেতনার প্রভাবমূলক গল্প

পরিদৃশ্যগতভাবে সমরেশ বসুর চরিত্রে খোলামেলা, দিলদরিয়া ভাবের একটা পরত থাকলেও স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন জেদী,আত্মবিশ্বাসী, অনমনীয় ও অভিমানী। মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা যৌনতা বোধ আর পাঁচটা স্বাভাবিক অনুভূতির মতোই তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে অনেকবার। মানুষের মনের সচেতন ও অচেতন অবাস্তব যৌনতা কিভাবে ওঠানামা করে তাকে তুলে ধরেছিলেন তিনি তাঁর ছোট গল্পের মধ্যে দিয়ে। তিনি মানতেন যৌনতা জীবনের অন্য সত্যগুলোর মতোই আরেকটি সত্য। এই সত্যকে অস্বীকার করলে জীবনের সাথে মিথ্যাচারিতা করা হয়। যৌনতা বা যৌন চেতনা কোন পাপ নয়, এটি একটি অন্যতম জীবন সত্য। একে অস্বীকার করলে জীবনের একটা দিক ঢাকা পড়ে যায় বলেই মানতেন তিনি। তাই তাঁর উপন্যাসের মতো গল্পগুলিতেও বার বার যৌনতাড়িত ও জীবন যন্ত্রণায় বিড়ম্বিত মানুষের কথা এসেছে। এই যৌনতা ও জীবনের একটি ধর্ম। সমাজচেতনতা, রাজনৈতিক চেতনা, মনস্তাত্ত্বিক চেতনা ও জীবন চেতনার মতো যৌন চেতনা একটি চেতনা। বিভিন্ন লেখায় যৌনতাকে বিষয় করে তুলে ধরার ফলে সমরেশ বসুর অনেক লেখা বিতর্কের কারণ হয়ে উঠেছিল কখনো কখনো। সমরেশ বসু সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেদের এবং লোকেদের জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে উপলব্ধি করেন জীবনের অন্যসব প্রবৃত্তির মতো যৌনচেতনাও একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাঁর বিশ্বাস ছিল নীচু তলার মানুষজন

যৌনতা বলতে ঠিক কি বুঝে থাকে এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে কি চোখে দেখে তা তিনি ভালোই বোঝেন। তাই তাঁর গল্পের অসংখ্য গরীব, অশিক্ষিত, খেটে খাওয়া মানুষের কাছে প্রেমের মতো সূক্ষ্ম চেতনার থেকে শরীর যে অনেক বেশি জাগ্রত তা তিনি ভালই বুঝতেন। তাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যৌন চেতনার বিষয়টিকে তুলে ধরেছিলেন তাঁর বেশ কিছু ছোট গল্পে ও উপন্যাসে।

সমরেশ বসু যৌনতাহীন প্রেমে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি নরনারীর যৌনতার মধ্যে প্রেমকে খুঁজেছেন। 'ভগবতী'[১] গল্পে লেখক দেখিয়েছেন ভগবতী নামে এক গাভীর প্রতি সঙ্গমলিপ্সু হয়ে ওঠা এক ভীষণাকৃতি ষাঁড়ের কাহিনী। ষাঁড়টি মিলিত হতে পারল প্রাণীজগতের অবাধ স্বাধীনতার ফলে। কিন্তু নওরঙ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী শ্যামদেঈ-এর কাছে দ্রষ্টা হয়েই থাকে। ষাঁড়টির মতো প্রচন্ড হয়ে উঠে সব ভেঙে চুরে দিতে পারে না। কারণ মানুষের জীবনের অবাধ স্বাধীনতা নেই।

'পোকা' গল্পে লেখক যৌনতার উপস্থাপন করেছেন বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই। গল্পটিতে এক লেখক চরিত্র সামুদ্রিক পোকার হাত থেকে মুক্তি পেতে আশ্রয় খোঁজে বান্ধবীর শরীরে এবং তাঁর শরীরেই লেখক চরিত্রটি খুঁজে পায় শরীরী সুখের আনন্দ।

'রতি প্রতিমা' গল্পে যুবক সলিল দু'বছর ধরে সম্পর্ক স্থাপন করে বহুবল্লভা অনুসূয়া শেঠী নামের এক নারীর সঙ্গে। সলিল ভাবে — 'রমণী সে যদি সুরূপা হয়, বুদ্ধিমতী ও রসিকা হয়, তার সঙ্গ পুরুষের জীবনকে উজ্জীবিত করে এটাই আমার বিশ্বাস।"[২] সলিল নিবিড় ভাবে সম্ভোগ করে দু'বছর ধরে। তার পরে অনসূয়া অন্য এক যুবকের সঙ্গে ভারতের বাইরে চলে যায় এবং ছয় মাস পরে আবার ফিরে আসে। কিছুদিন পরে তাকে এক ফিল্মস্টারের সাথে অত্যন্ত অশালীনভাবে পায় পুলিশ। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে

অনসূয়া। অনুসূয়া অবাধ যৌন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল। তাই নতুন নতুন পুরুষসঙ্গ তার অভ্যাস। সলিলই তার জীবনে একমাত্র পুরুষ নয়। গল্পের শেষে দেখা যায়, অনুসূয়া শেঠী আত্মহত্যা করে তার অবাধ যৌন স্বাধীনতার ইতি ঘটায়। সলিলের জন্য রেখে যায় নিজের উপলব্ধিতে ভরা একটি চিঠি — ''যৌনতাকেও আমরা সূক্ষ্মতম শিল্পের পর্যায়ে তুলতে পেরেছি। কিন্তু বাসনার আগুন সেই শিল্পকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। আমি বুঝতে পারছি প্রকৃতি আমার ওপর একটা প্রতিশোদ নেওয়ার জন্য ফুঁসছে।'' যৌনতা কখনো কখনো বাসনার চূড়ান্ত পরিণতি না হয়ে বিষময় হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ এই গল্পটির ট্র্যাজিক পরিণতি।

'ধূলিমুঠি কাপড়'[৩] গল্পে আবার রয়েছে যৌন বিকৃতির ঘটনা। শিক্ষিত, বুদ্ধিমান তরুণ রাজনৈতিক এবং সমাজসংস্কারক প্রমথ তার স্ত্রীকে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করে রাখে। অথচ সমাজে অনাথ শিশুদের নিয়ে তার আগ্রহের অন্ত নেই। এটা এক যৌন বিকৃতিরই নামান্তর। মধ্যবিত্ত স্তরের মানুষদের মধ্যে যৌন বিকৃতির ঘটনা নিয়ে লেখা গল্প 'ধূলি মুঠি কাপড়'। একদিকে সমাজ সংস্কারক, দর্শন গ্রন্থ পাঠে নিমগ্ন প্রমথ অনমনীয়ভাবে তার রূপসী, বিদূষী স্ত্রী অমলাকে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করে আবার অপরদিকে প্রমথ সমাজের অনাথ, অবহেলিত শিশুদের মঙ্গলের জন্য প্রচণ্ডভাবে উৎসাহিত। এই ব্যাপারে তার চেষ্টার অন্ত নেই। অথচ স্ত্রী অমলার সন্তান কামনা প্রমথের কাছে ভালবাসার ন্যাকামি বলে মনে হয়। এ এক যৌন বিকৃতির নামান্তর মাত্র। স্ত্রী, পুরুষের প্রেম, যৌনতা ও শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর চাইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেশি অস্বাভাবিকতা ও বিকৃতি লক্ষ্য করেছেন লেখক সমরেশ বসু। ফলে এগুলিই বিষয় হয়ে উঠেছে তাঁর বেশকিছু ছোটগল্পে বার বার।

'জন্মদাতা' গল্পটিতে যৌন আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করে এক সুন্দরী স্ত্রী গর্ভবতী হয়

তেরো-চোদ্দ বছরের এক বালককে দিয়ে। অশোক ঠাকুর 'জন্মদাতা' গল্পে মানুষের মনের অন্ধকার দিক ও যৌনচেতনাকে তুলে এনেছেন রহস্য ভেদ করে। 'জন্মদাতা' গল্পে এক সুন্দরী স্ত্রী, স্বাস্থ্যবান অথচ সন্তান দানে অক্ষম স্বামীকে লুকিয়ে নিজের যৌন ক্ষুধা মেটায় তার থেকে বয়সে অনেক ছোট তেরো-চোদ্দ বছরের এক কিশোরকে দিয়ে। সুন্দরী রমনীটি যখন সন্তান সম্ভবা হয় তখন তার স্বামী সেই সন্তানের জন্মদাতাকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব দেয় গোয়েন্দা অশোক ঠাকুরের ওপর। শেষ পর্যন্ত অশোক ঠাকুর খুঁজে বার করেন সন্তানের জন্মদাতাকে।

এরকমই একটি অবৈধ প্রেমের গল্প হল 'প্রিয়তম সে'। সেখানে এক মহিলার ভগ্নিপতি অবৈধ সম্পর্কের বশবর্তী হয়ে তাকে খুন করে। খুনিকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব নেয় গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর।

'নিষ্কৃতি পাবার স্টাইল' এর চরিত্র জয়ন্ত কস্তুরীর প্রেমে পাগল। যৌন আকর্ষণও বোধ করে। সকলের আপত্তি উপেক্ষা করে কস্তুরীকে বিয়ে করে সে। কিন্তু কস্তুরী একজন পুরুষে তৃপ্ত নয়। শেষ পর্যন্ত জয়ন্তর কস্তুরীকে হত্যা করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। শেষ পর্যন্ত এক প্রেমিককে দিয়েই কস্তুরীকে হত্যা করায় জয়ন্ত। অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে হত্যা করালেই নিষ্কৃতি। এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না জয়ন্তর।

'হতভাগ্যের শিকার' গল্পটিতে উচ্চপদস্থ অফিসারদের স্ত্রীদের যৌন লালসার শিকার এক ভদ্র,নম্র, শিক্ষিত কিশোর।

'কে নেবে মোরে' গল্পটিতে গ্রামের এক জোড়া তরুণ তরুণীর নিষ্পাপ যৌবন শহরের হাই সোসাইটির মুখোশ খুলে দিয়েছে ।

'তৃষ্ণা' গল্পে যুবতী বিমলার কষ্ট কেউ বোঝেনা। স্বামী পুত্র হারিয়ে জীবন যন্ত্রণায় সে কাতর। শাশুড়ি, প্রতিবেশীরা সতেরো বছরের যুবতী বউ বিমলাকে স্বামী পুত্র হারিয়ে

এক সর্বনাশী হিসাবে দেখে। কারণ তাকে ধরেছে মূর্ছা রোগ। জ্যোৎস্না রাতে সে রোগ বাড়ে। দক্ষিণ দিকের বাতাস গায়ে লাগলে মনে হয় আঁচল বেয়ে সাপ কিলবিলিয়ে উঠছে। চরিত্র নির্মাণে ওই আবছা ছায়াগুলোর আলোয় সুখদার বাইশ বছরের বিধবা বউ বিমলাকে তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরেন — ''মুখের সামনে গিয়ে দেখি কী এক আতঙ্কে বউ চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। শরীরে লেগেছে কাঁপুনি। নিঃশ্বাসও বুঝি পড়ে না। চোখের কোলে, নাকের ডগায় বিন্দু-বিন্দু ঘাম। কী হল?'' ভয় চাপা গলায় বলল বউ, 'দেখত মা, আমার আঁচলে কী?' কেঁপে উঠল সুখদার বুকের মধ্যে। খাড়া নজর দেখল উঁচিয়ে, কোন্ অঙ্গে লাগছে মায়াবিনীর সর্বনাশ। কাপড়ের আঁচল দেখে বলল, 'কই, কিছু নেই তো।' ভয়-হুতোশে বউ বলল, 'আমার যেন মনে হল, হিলহিল করে কোমর বেয়ে কী একটা উঠছে আমার গায়ে। ভাল করে দেখ মা। আমি যে স্পষ্ট টের পেলুম গো। সাপের মতো কিলবিল করে উঠল। আঁচল যেন ঝুলে আছে। দেখ একটু।''[৪] কোন কিছুতে কিছু হয় না। ডাক্তার, কবিরাজ, মন্ত্র মাদুলি দিয়েও কিছু হয় না। তাই সতী মায়ের স্থানে এবার মানত। রয়েছে অমানুষিক কষ্ট, পায়ে হেঁটে অনেক পথ চলা, দণ্ডি টানা। এই গল্পের বিশেষত্ব হল প্রকৃতি ও মানুষ কতখানি অন্তরঙ্গ হলেও অনেকখানি আলাদা মানুষের মনের জগতে। শাশুড়ি, বউ, গুরুমশাইয়ের সুদীর্ঘ যাত্রার ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। একের পর এক গ্রাম পেরিয়ে যাত্রা — ''কিন্তু বাতাস যেন আরো উন্মাদ, আরো উল্লসিত। তার বৈরাগ্যের আলখাল্লায় কিসের রঙ ধরে গেছে। গোটা সংসারে প্রাণকে দুলিয়ে, ফাপিয়ে মাতিয়ে ছুটেছে দিশাহারা হয়ে।'' শেষ অবধি অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে দন্ডী খেটে বিমলা যখন মায়ের স্থানে এসে পৌঁছায় তখন তার বোধ যেন জীবনের শেষ বিন্দুতে আশ্রয় খোঁজে। সতীমার মেলায় মশায়ের গুরু বনমালীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। সর্বজ্ঞ বাউল বনমালী বিমলাকে দেখে বলে ওঠে যে ভর নয়, ব্যামোও নয়, সুখদার বউ কাঁদে জীবন যন্ত্রণায়। ভালোবাসার প্রয়োজন তার।

গান গেয়ে সে বলে — ''মানুষ কারও যন্ত্র নয়, দণ্ডী খেটে, হত্যে দিয়ে প্রাণের প্রাণকে করবি জয়?'' বিমলার জীবন যেন যৌনচেতনার সুপ্ত প্রতীক। মানুষের স্বাভাবিক নিত্যনৈতিক জীবনের মধ্যে যৌনতা রয়েছে এবং সেই যৌনতা বা যৌনবোধ অনেক সময় তার যৌন যন্ত্রণারও রূপ নেয়। সমরেশ বসুর মতে, একজন পুরুষের মধ্যে যে রকম শারীরিক চাহিদা, ভোগবাসনা থাকে ঠিক একটি নারীর মধ্যে এইসব স্বাভাবিক ধর্মগুলো থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক যৌবনের ধর্ম।

'পাপ বোধ' গল্পের শিবতোষের জ্যাঠামশাইয়ের যৌন লালসার শিকার হয়েও তার স্ত্রীর মনে কোন অনুতাপের প্রকাশ দেখা যায় না।

যৌনতার প্রকাশ ঘটেছে যে কটি গল্পে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অন্যতম গল্প হ'ল 'মহাযুদ্ধের পরে'। গল্পটিতে জন্মান্ধ সুলা ও বটা নামে দুই ভিখিরির জীবনে আসে অন্ধ ভিখারিণী মেয়ে কুরুচি। কুরুচিকে একা ভোগ করবার ইচ্ছায় সুলা ও বটা পরস্পরের শত্রু হয়ে ওঠে। একজন আর একজনকে কুরুচি ভেবে হত্যা করে বসে। যৌনতা কতটা বিরাট আকার ধারণ করতে পারে তার প্রমাণ 'মহাযুদ্ধের পরে' গল্পটি। 'মহাযুদ্ধের পরে' গল্পটিতে প্রধান চরিত্র তিনটি হল, দুই জন্মান্ধ ভিক্ষুক বটা ও সুলা এবং এক জন্মান্ধ ভিখারিণী কুরচি। দুই জন্মান্ধ ভিক্ষুক তাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই অতিক্রম করেছে নারী, পৃথিবীর রূপ, রস ও গন্ধ বিবর্জিতভাবে। হঠাৎই তাদের ডেরায় এসে পড়ে জন্মান্ধ ভিখারিনী কুরচি। কুরচিকে ঘিরে দুই অন্ধ বন্ধুর মধ্যে জেগে ওঠে আদিম রিপুর বোধ। নারীর শরীর চিনতে শেখে তারা। কিন্তু মন চিনতে পারে না। শরীর এবং মনকে একা অধিকার করার ইচ্ছায় নিজেরাই নিজেদের শত্রু হয়ে ওঠে। কুরচির ওপর একাধিপত্য চালাতে চায় দুজনেই। ভয়ানক প্রতিহিংসায় বটা বন্ধু সুলাকে খুন করতে গিয়ে ভুল করে মেরে ফেলে কুরচিকেই। আর সুলা না বুঝেই কুরচিকে ভোগ করবে এই

আনন্দে মেতে ওঠে। শেষ অবধি ভুল ভাঙলে দু'জনেই কাঁদে একসাথে। এই গল্পটির বিষয়বস্তুর মধ্যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করে রয়েছে শরীর এবং এই শরীরকে ঘিরেই রয়েছে দুই জন্মান্ধর যৌনতাবোধ। গল্পটিতে দুই জন্মান্ধ ভিখারী বটা আর সুলার বর্ণনায় লেখক বলেন — ''ইতিহাসের আগে, আদিম যুগের গুহামানবের মতো নিতান্ত গোষ্ঠীবদ্ধ দুটি জীব। শব্দ দিয়ে যারা রূপকে দেখতে চেয়েছে, স্পর্শ করে রঙকে চিনতে চেয়েছে। কীট আর পতঙ্গের চেয়েও যেন অসহায়। ক্ষুধার মত প্রাকৃতিক বোধ আর অসুখের অনুভূতি ছাড়া মানুষ হিসাবে আর কোন দরকার নেই তাদের। কোন হিংস্রতা নেই।''[৫]

ওদের ডেরায় হঠাৎ আসে অন্ধ ভিখারিনী মেয়ে কুরুচি। অন্ধ কুরুচিকে নিয়ে বটা ও সুলার মধ্যে হিংসা শুরু হয়, জেগে ওঠে আদিম রিপুর বোধ। তারা দুজনেই একা কুরুচিকে দখল করতে চায়। ফলস্বরূপ ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসায় বটা সুলাকে খুন করতে গিয়ে কুরুচিকে খুন করে ফেলে। ভুল যখন ভাঙে দুজনেই তখন হাহাকার করে। কুরুচির খুনিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ জন্মান্ধদের কেউ সন্দেহ করে না। কিন্তু জীবনের কান্না থামে না — ''ওরা ভিক্ষে করে। তার পর রাত্রে ফিরে এসে কাঁদে ভাষাহীন সুরহীন গলায়।'' এই প্রসঙ্গে মনে পরে ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মালভা' গল্পের কথা। এ গল্পটিতে 'মালভা' তরুণীকে একান্ত করে পাবার লালসায় পিতা ভার্সিলি এবং পুত্র ইয়াকুবের মধ্যে তীব্র সংঘাত তৈরী হয় এবং শেষ পর্যন্ত ইয়াকুব মালভাকে লাভ করে। তবে ইয়াকুবও পরাজিত হয় সেরিওঝকার কাছে। কারণ সেরিওঝকার শারীরিকভাবে অনেক শক্তিশালী ছিল ইয়াকুবের থেকে। এ প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের কথাও বলা যেতে পারে। এই গল্পটিতে ভিখু পাঁচীকে অধিকার করার জন্য নির্মমভাবে বসিরকে হত্যা করে। এই সব গল্পে মানুষের জান্তব ও যৌন চেতনার প্রকাশ যেমন ঘটেছে তেমনি এগুলি বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা। সমরেশ

বসুর গল্প সেখানেই আলাদা যেখানে যৌনহিংসা বা প্রতিহিংসাই শেষ কথা নয়। দুটি মানুষ যারা প্রবৃত্তির অভিজ্ঞতা পেরিয়েছে তাদের মধ্যে আশ্চর্য কষ্টের অনুভূতিতে, মনুষ্যত্ত্বের উপলব্ধি তারা লাভ করেছে যৌনতার পথে।

'জন্মান্তরের জগৎ'[৬] সমরেশ বসুর লেখা একটি যৌন চেতনার প্রভাবমূলক গল্প। গল্পের নায়ক হলেন একজন প্রৌঢ়। তিনি বিত্তবান, স্বাস্থ্যবান এবং নিজের কাজের জগতে সফল। তার সন্তানেরা প্রবাসী, বিবাহিত এবং কৃতী। তার স্ত্রী আছে। কলকাতায় বেশ কিছুটা জমি ও বাগান সহ তার বাড়ী। বাড়ীতে রয়েছে টেনিস কোর্ট। একদিন তার সঙ্গে পরিচয় হয় পাশের বাড়িতে থাকতে আসা একটি মেয়ের সাথে। মেয়েটি উজ্জ্বলা। প্রাণবন্ত এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে ব্যতিক্রমী একটি চরিত্র উজ্জ্বলা। তার আছে অসঙ্কোচ, আত্মবিশ্বাস। ধারাল ব্যক্তিত্ব কিন্তু অগভীর নয়। তার নিজস্ব স্বাধীন এবং স্বাভাবিক যৌন চেতনা রয়েছে। উজ্জ্বলার প্রতি আকৃষ্ট হলেন প্রৌঢ়। আকৃষ্ট হলেন উজ্জ্বলার তারুণ্যের প্রতি। আর উজ্জ্বলা প্রৌঢ়ের পরিণত পৌরুষের প্রতি আকৃষ্ট হল। গল্প, বাগানে বেড়ানো এবং টেনিস খেলা এদের দুজনকে দুজনের আরো কাছাকাছি এনে দিল। আউটহাউসে মিলনও হল তাদের। এই মিলনে প্রৌঢ় যতটা অপ্রতিভ, উজ্জ্বলা একেবারেই নয়। অথচ ওরা কেউই চরিত্রহীন নয়। প্রৌঢ়ের এক দিকে প্রাণোচ্ছল জীবন সম্ভোগের টান আবার অন্যদিকে মেয়েটির ভবিষ্যৎ ও নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা। এই বিবিধ সমস্যায় মানসিক সংকটে ভুগতে লাগলেন তিনি ঘটনার পর থেকে। এক সময় সব চিন্তাভাবনার শেষ ঘটিয়ে উজ্জ্বলা অনমনীয় দৃঢ়তায় তার প্রৌঢ় বন্ধুর উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে ফিরে গেল তার নিজের জায়গায়। সে নিজেকে জীবন অভিজ্ঞ বলে মনে করেছে বলেই ফিরে যেতে পেরেছে। তার ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেবার অবকাশও দেয়নি সমাজে প্রতিষ্ঠিত পুরুষটিকে। যৌনতা বা যৌনচেতনা এই গল্পে থাকলেও তার পাশাপাশি রয়েছে মানুষের স্বাধিকার ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার কথা।

ঠিক একইরকম যৌন চেতনামূলক আরেকটি গল্প হল 'ঊরাতীয়া'[৭]। ঊরাতীয়া

নামের এক নারীকে কেন্দ্র করে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। এই দুই বন্ধু হল লাখপতি ও ঘামারি। দুই জনেই রেলওয়ে গেটম্যান। এই দুই বন্ধুর মধ্যে একজন অর্থাৎ লাখপতির স্ত্রী হল ঊরাতীয়া। ঊরাতীয়াকে কেন্দ্র করেই দুইজনের মনে জেগে ওঠে প্রতিহিংসা, ঈর্ষা আর রেষারেষি। ঊরাতীয়া বোঝে যে, তাকে কেন্দ্র করেই দুই বন্ধুর যত প্রতিযোগিতা। তাই সে আত্মঘাতী হয়। ঊরাতীয়ার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দুই মল্লবীর নিজেদের যৌনবোধকে বুঝতে পারে, চিনতে পারে।

এই রকমই আরেকটি গল্প হল 'শানা বাউরির কথকতা'। ধনসম্পদ ও যৌনতা মানুষের নিজেদের গড়ে তোলা সমাজে কিভাবে পাশাপাশি বিরাজ করে তার প্রমাণ এই গল্পটি। শানা বাউরির মতে, কেদার মুখুয্যের চার কুড়ি বিঘে ধানি জমি আছে বলেই সে জমিহীন শানা বাউরির স্ত্রীর সঙ্গে শুতে পারে। আবার দশ কুড়ি বিঘের ধানি জমিওয়ালা গগন বাঁড়ুজ্যে কেদার মুখুয্যের বোনের সঙ্গে শুতে পারে। গ্রামে যদি বিশ কুড়ি বিঘে জমি থাকতো তাহলে বাঁড়ুজ্জ্যের নাতনির সঙ্গে শুতে পারতো বলে মনে করে শানা। গল্পটির মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে শানা বাউরির সাহস, প্রতিবাদ করার ক্ষমতা, মধ্যবিত্তদের দুর্নীতি অপরদিকে রয়েছে বিত্ত সুখ বলে মানুষের যৌন সুখ কেনার মতো ব্যাভিচারের কথা। সুন্দর রায়, জীবন বাড়ুজ্যে হারান গাঙ্গুলির সঙ্গে শানা বাউড়িও রাতের অন্ধকারে মাথায় মাল পত্র নিয়ে জামশেদপুরের বাস ধরবে বলে চলেছে। যেতে যেতেই শানা বাউরি জীবিকা এবং সমাজে তাদের শ্রেণীগত অবস্থানটা কোথায় বোঝাতে কথকতা শুরু করে। সুন্দর রায়কে বলে — ''জমিদারিটো খারিজ হয়্যা গেলছে, ব্যাগার নাই, কিন্তুক আমাকে ভাত দিবার কুনকালে কেউ নাই।''[৮] শানার কথা সুন্দর রায়ও সমর্থন করে। তারপরে শানা শুরু করে তার নিজের দুঃখের কথা। — আপনকার ঘর থিকে দু ধামা ধান আনতে গিয়ে, উ আমার বউকে শুতে দেয়।'' শানার কথায় বাবুরা প্রশ্ন করে — ''শুতে দেয়?'' শানা আরও পরিষ্কার করে বলে — ''হুঁ আপনকাদের

সঙ্গে আপনকাদের ব্যাটা — লাতিদের সঙ্গে, ... বউটা পলায়ে গেল্‌ছে উয়ার বাপ ভায়ের কাছে।" চাকুরীজীবি তিনজন বাবু শানার কথায় খুব অস্বস্তিতে পরে যায়। তারা বলে শানাকে, বউকে ফিরিয়ে আনতে যেতে। শানা বলে সে দুবার গেছিলো কিন্তু ''না আর না। আমি ভাতের ধান্দায় ফিরি, পুরুষ মানুষ কতক্ষণ ঘরে থাকবে। কিন্তু আমার মা-টা আনকথা শুনায় বউকে। ... , আর ভর দুপুরে পাড়ায় বার হয়্যা যায়। সি সময়ে আসে আপনাদের নারান মুকুজ্জে মশায়ের লাতি বলে, ক্যাদারবাবু। শালো বাবুটোর চার কুড়ি বিঘা ধানি জমি আছে —।" তিনজন বাবুই আরও বেশি অস্বস্তিতে পরে কিন্তু শানা বলেই বলে চলে — '' কিন্তুক ক্যাদার মুখুজ্জের ধান আছে, তো উপার আপনকারা আছেন, পুলিশ দারোগা আছে, দুমকা সদরটা আছে। আমার কী আছে?" এরপর শানা সাংঘাতিক কথা বলে — ''শানা বাউরীর ধান থাকলে, ক্যাদারের বউটোকে লিয়ে শুতে যেত?" স্নায়ুতন্ত্রের তীব্রচাপে ''তিনজনেই দাঁড়িয়ে গেলেন শানাকে ঘিরে। ... তিনজনে বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ।' শানা তীক্ষ্ণ গলায় বলে, ''গগন বাড়ুজ্জে মশায়ের দশ কুড়ি বিঘা ধান জমি আছে, ওঁয়ার ছোটো ব্যাটা ক্যাদারের আইবুরো বুনটার সঙ্গে শোয়। কেনে? না, চার কুড়ি দশ কুড়িতে অনেক তফাত আছে হিসেবে। বিশ কুড়ি বিঘার মানুষ নাই আর গাঁয়ে, না হলে গগন বাঁড়ুজ্জে মশায়ের টুকটুকে লাতনিটাকে মন্দিরে লিয়ে শ্যুয়া থাকত আর একজনা।" তিনজনেই একসঙ্গে ফুঁসে উঠে শানাকে চুপ করাতে চায়। কিন্তু শানার গলাটা আরও চড়ল। ''হিশাব করে কেনে, আপনাকাদের চেয়ে ক্যাদার শালোর জমি বেশি আছে।" এবার শানাকে ভয় পাওয়া ছাড়া তিনজনের আর কিছু করার থাকে না। মাল বইবার চার আনা দিতে চাইলে সে নেয় না। — ''ব্যাগারটা উঠে গ্যালচে ছোট কত্তা, গাঁয়ে পীরিতটো উঠে নাই, উতে আমার ধম্মো নষ্ট হবেক।"

'অসংশয়' গল্পে বিপত্নীক কমল নিজের সামাজিক মান মর্যাদা ভুলে কিশোরী ইভুর প্রতি যখন আকৃষ্ট হন তখন তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ইভু অত ছোট মেয়ে, কিভাবে

কমলের মত প্রায় প্রৌঢ় একজন পুরুষের ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠতে চায় তা কমলের বোধবুদ্ধির বাইরে। অথচ কামনার বশবর্তী হয়ে সে নিজেকেও ইভুর কাছে সঁপে দেয়। পরবর্তীকালে মানসিক বিকারে নিজের ন্যায় নীতি বোধ ও সামজিকতার চেতনায় আত্মহনন করেন। তারপক্ষে যেমন সম্ভব ছিল না রোজকার জীবনে ফিরে আসা তেমনি সম্ভব ছিল না অবৈধ যৌনজীবন চালিয়ে যাওয়া। যৌন প্রবৃত্তিকে সমরেশ বসু এক অন্যতম মৌল জীবনধর্ম মানতেন। 'পাপ' ধারণার সঙ্গে একে জড়িয়ে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলতে তিনি চাননি। তাই তাঁর গল্পে কোথাও আসে যৌনপ্রবৃত্তির নানা রূপ, বিকৃত কামের কথা বা নিম্নবিত্তদের মধ্যেও থাকা যৌন প্রবৃত্তির কথা। যৌন চেতনামূলক গল্পের ভয়ঙ্কর নিদর্শন 'পাপপুণ্য' গল্পটি। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় বিন্দুর মৃতদেহ নিয়ে গদাই আর কেতু চলেছে মহাশ্মশানে। গদাই-এর বিবাহ বিচ্ছিন্না মেয়ে হল বিন্দু এবং এই বিন্দুকে বিবাহ করতে চেয়েছিল কেতু। বিন্দুর আত্মহত্যার কারণ কেতু না জানলেও গদাই জানে। তাই সে পাপবোধে দগ্ধ হতে থাকে। যৌনবোধের বশবর্তী হয়ে পচীর কাছে যেতে গিয়ে গদাই ভুলক্রমে নিজের মেয়ে বিন্দুর সঙ্গে সঙ্গম করে। বিন্দু এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে আত্মহত্যা করে আর গদাই বিন্দুর মৃতদেহ বয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে।

গল্পের শুরুতে দেখা যায় যে বিন্দু গলায় দড়ি দিয়েছে। গদাই আর কেতু মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চলেছে শ্মশানে। সেই শবযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। কেতু জানে না বিন্দু কেন গলায় দড়ি দিয়েছে। কেতুর মতো লেখকও যেন আত্মহত্যার কারণ বুঝতে পারেন না — ''কিছু বুঁইতে পারলাম না।''[৯]

কেতু যেহেতু বিন্দুকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তাই সে গদাইকে শ্বশুরজ্ঞানে বিন্দুর বাবাকে বাবা ডাকতে যায়। কিন্তু গদাই বারণ করে। কারণ নিজেকে সে বাবা বলার যোগ্য মনে করে না। আঁধার রাতে ভুলক্রমে পচীর বদলে বিন্দুর সঙ্গে সঙ্গমের পরে সে

যখন পচীর নাম ধরে ডাকে তখন বলে ওঠে বিন্দু ''অই গো, তুমি বাবা।'' এরপরেই বিন্দুর আত্মহত্যার ঘটনা। মেয়ে আত্মহত্যার পরে তার মৃতদেহ নিয়ে চলে গদাই। মেয়ের চিতায় আত্মাহুতি দেয়। এভাবেই সে একটি ঘৃণ্য অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে মূল্যবোধ ও নীতিবোধের পরিচয় দেয়।

'উত্তাপ' গল্পটিতে যৌনতা সম্পর্কে মধ্যবিত্ত আর প্রাকৃত মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গীটি তুলে ধরেছেন সমরেশ বসু। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন সাঁওতাল পরগণার একটি গ্রামের অবস্থাপন্ন যুবক হরেন রায়। আর প্রাকৃত মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বাউরি ঘরের কৃষি-মজুরদের চারজনের একটি দল। এই দলটির মধ্যে রয়েছে একজন বুড়ো। এদের মধ্যে এক যুবতি এক মুমূর্ষু যুবককে অনায়াসেই সুস্থ করে তোলে তার নগ্ন বুকের উষ্ণতা দিয়ে। ছ'মাস মরে যাওয়া ছেলের স্মৃতিকে ভুলতে না পেরে সেই রমণী মানবিকবোধে অপরিচিত যুবক হরেনকে বুকের উত্তাপ দিয়ে যখন সুস্থ করে তুলছে ঠিক এমন সময় শরীরে বল ফিরে পাওয়া হরেন রমণীটির উপকারিতাকে কলুষিত করে তোলে কামাতুরতায়। মেয়েটির উপকারকে যথাযোগ্য সম্মান তো দিতেই পারে না, উপরন্তু যৌনবোধে আক্রান্ত হয়ে অসম্মান করে। মুহূর্তের মধ্যে হরেনের জীবনদাত্রী সাঁওতাল রমণীটি এক ঝটকায় ফেলে দেয় হরেনকে। এক কলঙ্কহীন নিম্নবিত্ত শ্রেণীর নারী তার আত্মসম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু হরেন তার মানবিকতাকে বোঝে তো নাই উল্টে যৌনতাবোধে জীবনদাত্রীকে অসম্মান করে। মেয়েটি সঙ্গত কারণে ফুঁসে উঠে বলেছিল — ''আ মরণ, কেন্নোর মরণ গো — ই বাঁচবেনি দেখছি গো।''[১০] এক অপরিসীম ঘৃণা ও অভিমানে যেন প্রকৃতি বুকের কাপড় শক্ত করে বাঁধে। শ্লীল ও অশ্লীলতার বিবেচনার বাইরে নারী চরিত্র এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠে দুই স্তরের মানুষের সহবত, নৈতিকতা ও সামাজিকতার পার্থক্য দেখায়।

'নাচঘর' গল্পটিতে দেখানো হয়েছে সুতীব্র যৌনতাবোধ কোন মানুষকে কিভাবে

চালিয়ে নিয়ে যায়। গল্পের চরিত্র বৃদ্ধ জেমস ওয়াইলি তার যৌবনের সময় কাটানোর অন্যতম স্থান প্রিয় নাচ ঘরটিতে ফিরে আসেন। তার যৌবনের অনেকটা সময় কেটেছে এই নাচ ঘরটিতে। সেই নাচঘরটিতেই জেমস-এর সাথে এমেলিয়ার প্রেমপর্বের পর জুডির সাথে দেখা, ঘনিষ্ঠতা, প্রেম ও বিবাহ। বৃদ্ধ জেমস অনেক অনুশোচনায় ভোগেন পুরোনো কথা মনে করে। তার মনে পড়ে যায় কিভাবে তিনি জুড়ির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন মহিলার প্রতি আসক্ত ছিলেন। জুডি একসময় স্বামী জেমসের ভালোবাসা হারানোর বেদনায় হিংসার বশবর্তী হয়ে গোয়ানীজ রমণী লুক্রেজিয়াকে হত্যা করেছিলেন। এসব কিছুর জন্য জেমসই দায়ী ছিলেন। জেমস ওয়াইলির বিকৃত যৌনতাবোধ এবং পরবর্তীকালে তার আত্মগ্লানি ও অনুশোচনা 'নাচঘর' গল্পটির বিষয়বস্তু। একটি গানে জেমস সেই মর্মব্যাথা ব্যক্ত করেছেন — ''খোদা তুমি আমাকে কেন এমন ফুলের বাগিচায় পাঠিয়েছ? আমার চোখ আছে দেখতে পারি, নাক আছে গন্ধ পাই, আমার চামড়ার নীচে প্রতিটি রক্তকণা সবকিছুই ছুঁয়ে স্বাদ নিতে চায়। তুমি অনেক কাঁটা রেখেছ বটে কিন্তু কাঁটার যন্ত্রণা আর রক্তপাত যে আমাকে দমাতে পারে না।''[১১]

যৌনতাবোধ বা যৌন চেতনা অনেক সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের মধ্যেও এক ধরনের বিকৃতি বা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সৃষ্টি করে। এই বিষয়কে তুলে ধরেছেন সমরেশ বসু তাঁর বেশ কয়েকটি ছোট গল্পে। এই রকমই একটি ছোটগল্প 'চেতনার অন্ধকারে'।[১২] এই গল্পটির নায়িকা ললিতা। ললিতার বিয়ের কিছুদিন আগের একদিনের ঘটনা তুলে ধরেছেন গল্পটিতে লেখক। সেইদিন রাত্রে ট্রেনে করে যাওয়ার সময় শরীর ও মনের বিচিত্র রহস্যে ললিতা মিলিত হয় চল্লিশোর্ধ্ব এক পুরুষের সাথে। সেই মিলনের চিহ্ন যখন ললিতার দেহে প্রকট হতে থাকে তখন সেই পরিস্থিতিতে ললিতার মধ্যে অপরাধবোধ আসে। সে তার প্রেমিক প্রবীরের কাছে তার পাপবোধের কথা এবং

অপরাধবোধকে স্বীকার করে তুলে ধরে। এইভাবে ললিতা স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে নিজের অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতে চায়। এইরকম আরেকটি গল্প হল 'কামনা বাসনা'।[১৩] এই গল্পের নায়কের নাম অনল আর নায়িকার নাম জয়তী। অনল তরুণ অধ্যাপক। একটি ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দিতে গিয়ে অনলের সঙ্গে কোটিপতির সুন্দরী স্ত্রী জয়তীর আলাপ হয়। অনলের ছিল অর্থের প্রতি লোভ আর জয়তীর ছিল যৌনতার প্রতি লোভ। ফলস্বরূপ জয়তী অর্থের লোভ দেখিয়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় অনলের সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুজনের শারীরিক মিলনও ব্যর্থ হয়ে যায়। ঠিক একইরকমভাবে 'বোঝাপড়া'[১৪] গল্পের নায়িকা, নায়কের সাথে শুধু শারীরিক সম্পর্ক তৈরী করতে চেয়েছিল। চায়নি কোন প্রেমের সম্পর্ক তাদের মধ্যে তৈরী হোক। এইরকমই একটি বোঝাপড়া করতে চাইলেও সে ব্যর্থ হয়। কারণ তার আগের রাতের খদ্দের ফিরে আসে। এইখানে আর্থিক সমস্যা কিভাবে যৌনতায় প্রভাব ফেলেছে তাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন সমরেশ বসু। 'সহযাত্রী' নামের দুটি গল্পের একটিতে লেখক দেখিয়েছেন যৌনতা বা যৌনবোধ কিভাবে মানুষের মধ্যে অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলে।

'সহযাত্রী'র মধ্যে দুটি গল্প রয়েছে। একটাতে গণিকাসক্ত শহরের বাবুর বহুরুপীর মতো সভ্য সমাজে মিশে থাকার প্রতি ব্যঙ্গ আর অন্যটিতে গ্রামের হাটুরে মানুষের যৌনচেতনার জন্য অপরাধবোধ রয়েছে। দুটি গল্পের পটভূমি ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট। দ্বিতীয়টিতে বর্ধমান জেলার বেরেলা গ্রামে সহযাত্রী, সহজ সরল স্বভাবের মানুষটি লেখকের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে চলে। আর তার সাথেই অনর্গল উৎসাহ হকারদের সঙ্গে কথা বলার। যেহেতু গ্রামের মানুষ,ফলে তার হাত দিয়ে পয়সা সহজে বের হয়না। এরমধ্যেই যখন লোকটি এক বই বিক্রেতাকে ডেকে বসে তখন একটা নাটক জমে ওঠে। বিক্রেতা তাকে বই গছাবে। ডিটেকটিভ, সামাজিক উপন্যাস থেকে শুরু করে

গীতা, রামপ্রসাদ, লক্ষ্মীর পাঁচালি একের পর এক লোকটিকে দেখাতে থাকে। তার পরই এমন একটা বই তুলে দেয় হাতে যা দেখে লোকটি বিকৃত, বিস্মিত লজ্জায় পয়সা বের করে দেয় বইটি কেনার জন্য। বইটি আসলে একটি যৌন বিষয়ক বই। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষটি একদিকে নিজের যৌন চেতনাকে অস্বীকারও করতে পারছে না আবার সেটা প্রকাশ করতেও লজ্জা পাচ্ছে। লেখক দেখলেন — ''একটা ভয়ঙ্কর অপরাধের গাঢ় ছাপ পড়ে তাকে ভীরু ও পলাতক বলে মনে হচ্ছে। সে যেন চুরির মাল সরাতেও পারছে না, রাখতেও পারছে না কাছে।'' তার একটু পরেই তার স্ত্রী ঘুম থেকে জেগে উঠবে সেটা বুঝতে পেরে বইটি জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। সাথে সাথে যেন ফেলে দেয় তার বহু কষ্টের বারো আনা। সে কারণে তার নিজের বউএর ওপর সে রেগে যায়। লেখকের বর্ণনায় — ''সে বেচারী ঘুমের ঘোরে হকচকিয়ে গেছে। কি করে জানবে, এটা নিতান্তই তার স্বামীর টাকার শোক। তার অনুশোচনার, দুঃখের, খেটে খাওয়া পয়সার শোকের আর অপরাধের অদ্ভুত প্রকাশ। তাছাড়া আর কাকে সে মারতে পারে, খিঁচোতে পারে।'' এখানে একটা জিনিস দেখা যায়, গ্রামের দরিদ্র মানুষের যৌনতা বিষয়ে যতটা সতেচন ততখানি ভিতু, অপরাধ তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। শহরের জীবনের অভিজ্ঞতাই এই জন্য দায়ী। কিন্তু যখন সেই মানুষটিই আবার বিকৃতি কাটিয়ে উঠে লেখককে বলে — ''যদি আসেন কখনো বঁইচির দিকে, আসবেন আমাদের গাঁয়ে, গ্যাংটাং রোডের পচ্ছিমে, বেরেলা গাঁ, পূব পাড়ায় ইতুদিগরের ছেলে ছিচরন দিগর আমার নাম। আমরা পাড়াগাঁয়ের মানুষ। গেলে বড় খুশি হই...''[১৫]

প্রথম গল্পটির সহযাত্রীকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে শহরের কেতাদুরস্ত বাবু দুই পতিতাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলেছেন তার গন্তব্যে। দুই সহযাত্রীর যৌনতা বোধের প্রকাশ দুই রকম।

সাইত্রিঁশ বছরের যুবকের বিকৃত বিবর মুক্তির আনন্দ 'বিবর মুক্ত' এই গল্পটিতে

রয়েছে। ছেলেবেলার ভুলে বন্ধুর সাথে পরামর্শ করে যে ছেলেটি পরীক্ষায় ফেল করার দুঃখ ঢাকতে ট্রেনের তলায় গলা দিতে গিয়েছিল কিন্তু বন্ধুর দিক্‌ভ্রান্ততায় এবং আত্মরক্ষার তাগিদে মাথা বাঁচালেও পা দুটি বাঁচেনি, সেই ছেলেটি এখন যুবক। নাম তার নরেন কুন্ডু। এই নরেন কুন্ডু বিকলাঙ্গ জীবন এবং অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে বাইশ বছর ধরে। কিন্তু তার বন্ধু হারান স্বাভাবিক জীবন কাটাচ্ছে। নরেন আস্তে আস্তে পরিবার, আত্মীয়, প্রতিবেশী সবকিছু থেকে নিজেকে আলাদা করেছে,তার জায়গা হয়েছে ফাটা, চটা দুর্গন্ধযুক্ত মেঝেতে। বাইরের ঘরে মানুষ ডোবা নর্দমার ইঁদুরের আড্ডায়। জলতেষ্টা পেলেও সে জল পায়না। আস্তে আস্তে মনুষত্ব হারিয়ে জঘন্য পশুতে পরিণত হতে থাকে। কিন্তু আর পাঁচটা মানুষের মত তারও অন্যান্য চাহিদার মতো যৌনতাও অত্যন্ত আবশ্যিক বলে নরেনের মধ্যে যৌন বিকৃতি দেখা দেয়। নিজের যৌন চাহিদাকে কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারে না — ''সেই নিষ্ঠুর স্বপ্নের সব লক্ষণ আমার শরীরে ফুটে উঠে। ঘৃণায় এবং আনন্দে আমার রক্তের উল্লাসকে আমি উন্মত্ত খেলায় মাতাই। ...আমি সত্যিই পাগল নই। তবু সেই ক্ষ্যাপা মোষটাকে আমি মরতে দেখি। একটি অদৃশ্য বিষাক্ত তীরের মার খেয়ে, ওকে আমি মরতে দেখি। অবসাদ, ঘুম, মুক্তি আসতে থাকে।'' নরেনের এই আচরণের জন্য সকলেই তাকে উপহাস করে। তার দাদা, এমন কি ছোট ভাইও তাকে জানোয়ারের মতো পেটায়। একদিন সে তার বন্ধু হারানের দুটো অক্ষত পা দেখে প্রতিহিংসায় ফেটে পরে। বিবর মুক্ত হয়ে নরেন চায় হারানকে মেরে নিজে মরতে। তাই ভোর হতে না হতেই বঁটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পরে নরেন। বহুদিন পর প্রকৃতির স্পর্শে এসে তার দেহের সাথে সাথে মনের বিকারও দূর হয়ে যায় — ''হারান, আমার যে সময় হল না। আর আমি সময় চাইনে। আমি কি জানতাম, বাইরে পৃথিবীটা আছে। সেখানে এত আনন্দ আছে? শুধু আমি গর্তের মধ্যে বাইশ বছর ধরে, একটা ধিক্কার, বিকার, কষ্ট, দুঃখ, অনুশোচনা, যন্ত্রণাকে বাড়িয়েছি। বিরাট করেছি, বিশাল করেছি। ...

হারান তুই কাজে যা। আজ বুঝি শুধু তোর কাছেই আমার বিদায় নেওয়া বাকি ছিল।"[১৬] শেষ পর্যন্ত নরেন আত্মহত্যা করে এবং তার মধ্যে দিয়েই তার নিজের বিবর মুক্তি ঘটায়।

'ভোগের বিসর্জন'[১৭] গল্পের নায়িকা যুথিকা তার যৌনতা ভোগের স্বপক্ষে কিছু যুক্তি রেখেছে। এই যুক্তিগুলিকে লেখক মেনে নিতে পারেন নি। 'গুনিন' গল্পে নকুড় আকৃষ্ট হয়েছিল একই গ্রামের স্বজাতি (বাগদি) হরিমতীর প্রতি। কিন্তু নকুড় কিছু করত না বলে কালী মোড়লের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয় হরিমতীর। আর নকুড় হয় দেশান্তর। কিছুদিন পরে গুনিন পেশাকে সম্বল করে গ্রামে ফেরে নকুড়। হরিমতীর সাথেও দেখা হয় একদিন। নকুড়কে সবাই এখন খুব খাতির করে। হরিমতীও। যদিও নকুড় হরিমতীর আশা করে গ্রামে ফেরেনি। তাও হরিমতী যেন — ''আচমকা সব গুছোনো বস্তু হুড়মুড় করে পড়ে যাওয়ার মতো।"[১৮] হরিমতী ইতিমধ্যে বিধবা হয়েছে। যৌবনবতী হরিমতীকে দেখে আবার আকৃষ্ট হয় গুনিন নকুড়। বশীকরণ করে পেতে চায় হরিমতীকে এবং শেষ পর্যন্ত এই বশীকরণ করার পাল্লায় পড়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে হয় নকুড়কে। 'অরণ্য নিশি' গল্পে শহরের শিল্পী অরণ্যের আদি মায়ায় প্রকৃতি ও নারী উভয়েই ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। শহুরে মন সবকিছু ভুলে বনবালা মাঞ্জারিকে বিয়ে করে সংসার করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তা সফল হয় না। বন্ধুর চেষ্টায় তা সফল হয় না। অরণ্য নিশির ঘোর কাটিয়ে ফিরে যেতে হয় তাকে। শুধু ফিরে আসার সময় দেখেন — ''আশ্চর্য! মাঞ্জারিরা সমসময় গান করে। যখন কাঁদে তখনও।"[১৯] তিনি ভাবেন যতই তাকে চলে যেতে হোক, বন্ধু যতই তাকে কোলকাতা পাঠানোর ব্যবস্থা করুক তিনি আবার ফিরে আসবেন মাঞ্জারের ফুল নিতে। এই গল্পের মধ্যে দিয়ে যৌনতার ভেতর চিরন্তন মানব বেদনার প্রকাশ ঘটে।

'**রাজা মেমসাহেব সংবাদ**'[২০] এই গল্পটিতে মানুষের সঙ্গে জান্তব সম্পর্কের পাশাপাশি দুটি কুকুর বেড়ালের মধ্যে মানবিক সম্পর্ককে লেখক তুলে ধরেছেন।

'মূল্যবোধ'[২১] এই গল্পটিতে লেখক শহরের সভ্য শিক্ষিত মানুষের সাংস্কৃতিক কৃষ্টি ও মূল্যবোধের জন্য বাস্তব কিভাবে সম্পূর্ণ ভেঙে যেতে পারে তা দেখিয়েছেন। যারা নারীর সতীত্ব, কৌমার্য ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য জীবনে বেঁচে থাকা অপেক্ষা মৃত্যু বরণ করাকেই শ্রেয় বলে মনে করে সেই তারাই স্বপ্নে অধরা দেবীকে ভুলে বাস্তবের ধরা দেবীর জন্য লালসায় ঝাপিয়ে পড়তে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ

১) রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা — 'কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু ঃ সামগ্রিক মূল্যায়ন' দ্বিতীয় খন্ড — রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা সম্পাদিত — পূর্বাশা প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭ — পৃষ্ঠা-২৭৪

২) ঐ — পৃষ্ঠা ২৭৬

৩) ঐ — পৃষ্ঠা ২৭৬-২৭৭

৪) বড়ুয়া, সাধনা — 'শব্দ' সাহিত্য পত্রিকা — 'সমাজ ও সময়-সচেতক সমরেশ বসু' — সম্পাদক বড়ুয়া, সাধনা — প্রকাশকাল ১১ই ডিসেম্বর ২০০৮ — পৃষ্ঠা ১৭৭

৫) রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা — 'কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু ঃ সামগ্রিক মূল্যায়ন' দ্বিতীয় খন্ড — রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা সম্পাদিত — পূর্বাশা প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭ — পৃষ্ঠা-২৬৯

৬) ঐ — পৃষ্ঠা ২৭৩

৭) ঐ — পৃষ্ঠা ২৬৯

৮) বড়ুয়া, সাধনা — 'শব্দ' সাহিত্য পত্রিকা — 'সমাজ ও সময়-সচেতক সমরেশ বসু' — সম্পাদক বড়ুয়া, সাধনা — প্রকাশকাল ১১ই ডিসেম্বর ২০০৮ — পৃষ্ঠা ৪৪৬

৯) রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা — 'কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু ঃ সামগ্রিক মূল্যায়ন' দ্বিতীয় খন্ড — রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা সম্পাদিত — পূর্বাশা প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭ — পৃষ্ঠা-২৯১

১০) বড়ুয়া, সাধনা — 'শব্দ' সাহিত্য পত্রিকা — 'সমাজ ও সময়-সচেতক সমরেশ বসু' — সম্পাদক বড়ুয়া, সাধনা — প্রকাশকাল ১১ই ডিসেম্বর ২০০৮ — পৃষ্ঠা ৪৩৯

১১) রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা — 'কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু ঃ সামগ্রিক মূল্যায়ন' দ্বিতীয় খন্ড — রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা সম্পাদিত — পূর্বাশা প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭ — পৃষ্ঠা-২৭১

১২) ঐ — পৃষ্ঠা-২৭৫

১৩) ঐ — পৃষ্ঠা ২৭৫

১৪) ঐ — পৃষ্ঠা ২৭৫

১৫) বসু, ড. নিতাই — 'সমরেশ বসু গল্পসমগ্র-১' — বসু ড. নিতাই সম্পাদিত — মৌসুমী প্রকাশনী ১৯৯০ — পৃষ্ঠা ৫৩

১৬) রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা — 'কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু ঃ সামগ্রিক মূল্যায়ন' দ্বিতীয় খন্ড — রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা সম্পাদিত — পূর্বাশা প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭

— পৃষ্ঠা-২৭১

১৭) ঐ — পৃষ্ঠা ২৭৬

১৮) ঐ — পৃষ্ঠা ২৫১

১৯) বসু, ড. নিতাই — ‘সমরেশ বসু গল্পসমগ্র-১’ — বসু ড. নিতাই সম্পাদিত — মৌসুমী প্রকাশনী ১৯৯০ — পৃষ্ঠা ১৭১

২০) রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা — ‘কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু ঃ সামগ্রিক মূল্যায়ন’ দ্বিতীয় খন্ড — রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা সম্পাদিত — পূর্বাশা প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭ — পৃষ্ঠা-২৭৭

২১) ঐ — পৃষ্ঠা ২৭৭